# স্কুলে যৌনশিক্ষা

## একটি গভীর চক্রান্ত

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

গ্রন্থরশ্মি

২০৬ বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০ ০০৬

# স্কুলে যৌনশিক্ষা

নতুন প্রজন্মকে কলুষিত করে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার

এক ঘৃণ্য চক্রান্ত

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থরশ্মি

২০ বিধান সরণী, কলকাতা—৭০০ ০০৬

## সূচীপত্র

## = এই লেখকের বই =

মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি - ৪৫.০০

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা - ১০০.০০

পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা - ৩০.০০

মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা - ১২.০০

ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা - ৫.০০

কল্যাব্দ ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক হিন্দু কালগণনা পদ্ধতি - ৫.০০

দীপা মেহেতোর ওয়াটার ঃ নান্দনিক শিল্প না হিন্দু
সংস্কৃতির উপর কলঙ্ক লেপন -৩.০০

হোসেপুর রহমান ও ইসলাম (যন্ত্রস্থ)

## স্কুলে যৌনশিক্ষার সপক্ষে যাঁরা ওকালতি করছেন

গত ৪টা ডিসেম্বর, ২০০০, কলকাতার বহুল প্রচারিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার 'যৌনশিক্ষা বনাম যৌন-অশিক্ষা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। তা থেকে জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও জাতীয় এডস্ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌনশিক্ষা দেবার এক পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় স্তরে গৃহীত হয়েছে এবং ছয়টি রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্কুল পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে। আরও জানা গেল যে, আপাতত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই শিক্ষা দেওয়া হবে এবং এর জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজও এগিয়ে চলেছে।

উক্ত সম্পাদকীয়তে এই প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানানো হয়েছে এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই শিক্ষার দ্বারা যৌনাচার ও প্রজনন সংক্রান্ত শারীরিক ও মানসিক সমস্যাদি সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। আজ সঠিক যৌনশিক্ষা ও সচেতনতা না থাকার ফলে যুবসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং স্কুলে যৌনশিক্ষা দিলে এসব সমস্যা দূর হবে। তাই সম্পাদক মহাশয় লিখছেন, "পাঠ্যক্রমের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কহীনতা যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যে দেশে নূতন সহস্রাব্দের প্রাক্কালেও ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী বন্দনা শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন সরকারের কর্তাব্যক্তিরা, সে দেশে এই নূতন উদ্যোগ যে বৈপ্লবিক, সে সম্পর্কে সংশয় থাকিতে পারে না।" অর্থাৎ এই নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে পুরনো সব কিছু বর্জন করতে হবে, যা কিছু ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কার সব বর্জন করতে হবে। বিদ্যাদেবীর বন্দনা, আরাধনাও পুরানো বস্তাপচা সংস্কার মাত্র, যার ফলে দৈনন্দিন জীবনের কোনই সম্পর্ক নেই। তাই দেবী সরস্বতীকেত্যাগ করতে হবে। আধুনিক হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগ আছে একমাত্র যৌনাচার ও প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যার। তাই সরস্বতীকে শিকেয় তুলে রেখে শুধু যৌনাচার ও প্রজননের দিকে মন দিতে হবে এবং তার পরিপুষ্টির জন্য নবম শ্রেণী থেকে যৌন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সব দিক দিয়ে আধুনিক হতে হবে।

সম্পাদক মহাশয় তারপর লিখছেন, "যে উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল, তাহা এত বিলম্বে আরম্ভ হইল কেন?" প্রশ্নের জবাব হিসাবে সম্পাদক

মহাশয় লিখছেন যে, অতীতে এন সি ই আর টি বেশ কয়েকবার এই প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছু অবাঞ্ছিত লোকের বাধাদানের ফলে তা পণ্ড হয়ে যায়। এই সব অবাঞ্ছিত লোকেরা হল সঙ্ঘ পরিবারের লোক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির স্বনিযুক্ত দ্বাররক্ষক। এরা মনে করে যে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষা দিলে তা "সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির সারাৎসারটিকে অপবিত্র করিবে।"

সম্পাদক মাহাশয় তারপর যা বলতে চেয়েছেন তার মর্মার্থ হল, এডস্-এর মত কালান্তক ব্যাধি আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্কুল কলেজে যৌনশিক্ষা দিলেই ভারতীয় সমাজ তা থেকে রক্ষা পেতে পারবে। তাঁর মতে, আগে অনেকে মনে করেছিল যে, রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজের মূল্যবোধই এডস্ রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নি। এডস্-এর কৃষ্ণচ্ছায়া আজ দক্ষিণ এশিয়াতেও সমানভাবে প্রসারিত হয়েছে। একমাত্র যৌনশিক্ষাই এই বিপদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। কাজেই সম্পাদক মহাশয় লিখছেন, "তাই যৌনশিক্ষার আয়োজন এ দেশে আজ অপরিহার্য, শুধু এডস্ প্রতিরোধের প্রকরণ হিসাবেই নহে, শারীরসংস্থান ও যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধির জরুরি লক্ষ্যেও, জন্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য সহায়ক হিসাবেও।"

সম্পাদক মহাশয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা সেই মান্ধাতার আমলেই পড়ে আছে কারণ এখানে চলছে এক বৃদ্ধতন্ত্রের শাসন। এর ফলে এখানকার বাসিন্দাদের নাবালকত্ব দূর হচ্ছে না। স্কুলে যৌনশিক্ষা দিলেই তাদের নাবালকত্ব দূর হবে। তারা সাবালক হবে। তাই তিনি লিখছেন, "এই রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের, বহু বিষয়ের পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ অচল ও অবান্তর। এই সামগ্রিক পশ্চাদ্মুখিতার সহিত যুক্ত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতিতে বৃদ্ধতন্ত্রের শাসন। এই তন্ত্র অল্পবয়সীদের শিক্ষা ও জ্ঞানকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সর্বদাই তৎপর, সেই নিয়ন্ত্রণ বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ অকার্যকর এবং বহুলাংশে ক্ষতিকর হইলেও। যথার্থ যৌনশিক্ষার অভাবই কুশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতেছে, এই সত্যটি বুঝিয়া তাঁহারা অবিলম্বে এই রাজ্যেও ছোটদের ঈষৎ বড় হইতে দিবেন কি?"

সম্পাদক মহাশয় এখানেই থেমে থাকেননি। এর প্রায় দিন দশেক বাদে, গত ১৩ই ডিসেম্বর তিনি 'এডস্ : বিপদ গভীর' শিরোনামে আরও একটি জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় লিখলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সম্পাদকীয়খানির মূল বক্তব্য ভারতে এডস্ রোগের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু অন্তিম সিদ্ধান্ত সেই এক, স্কুলে স্কুলে সকল ছাত্রছাত্রীকে যৌন শিক্ষা দাও। তাহলেই তারা এডস্-এর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। ওই সম্পাদকীয়তে তিনি লিখছেন যে, "ইউ এন/এডস্ সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে ১০০০ সাবালক ভারতীয়র মধ্যে সাতজন এইচ আই ভি

পজিটিভ এবং ছয়টি রাজ্য—মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কার পর্যায় পার করে গিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে ব্যাধির প্রকোপ এখনও 'হাই রিস্ক' অর্থাৎ সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত—যাহাদের মধ্যে গণ্য করা হয় যৌনকর্মীদের (যাঁহারা পুরুষও হইতে পারেন) ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের।"

তারপর তিনি জানাচ্ছেন যে, বর্তমান ভারতে প্রাদুর্ভাবের হার ০.৭ শতাংশ এবং এই হার ৫ শতাংশে পৌছালে তা এমন দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে যে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই রোগের কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই প্রতিরোধই একমাত্র পথ। বর্তমানে 'হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট' নামে পরিচিত ৩০টি ওষুধ পাওয়া যায়, যাতে আংশিক উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু এই চিকিৎসার খরচ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে যে আসল উদ্দেশ্যটি লুকিয়ে আছে তা প্রকাশ পেয়েছে শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে। সম্পাদক মহাশয় লিখছেন, "চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই প্রধান প্রতিরক্ষা। সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযান তো চলিতেছে। জনসাধারণকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কি? নাবালকও আক্রান্ত হইতে পারে, তাহাদের শিক্ষার জন্য কী করা হইবে? স্কুলে যৌন বিষয়ক শিক্ষাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে, এইচ আই ভি/এডস্ তো দূরস্থান।" কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সম্পাদক মহাশয়ের আসল উদ্দেশ্য হল, প্রথমত নাবালকদেরও এডস্ হতে পারে বলে ভয় দেখানো এবং দ্বিতীয়ত সেই 'নাবালকদের এডস্ ও যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেবার সুপারিশ করা।

গত ৯ই জানুয়ারী, ২০০১, আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে 'নতুন বাঙালি' নামে ৪৮ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ রঙীন ও আর্ট পেপারে ছাপা একটি ক্রোড়পত্র বিলি করা হয়। ইংরাজি নতুন বছরের প্রাক্কালে আনন্দের আতিশয্যে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ যে ঐ মূল্যবান ক্রোড়পত্রটি সবাইকে বিনা পয়সায় বিতরণ করেননি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কে বা কারা এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তার বিচার-বিশ্লেষণও আমরা এখন করব না। সেই ক্রোড়পত্রে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ আছে এবং যেই সব অতিশয় মূল্যবান লেখক ও সাহিত্যিকগণ তার পাতা ভরিয়েছেন, সেই সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলব।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'তাতে দোষের কি আছে?' শিরোনামে একখানা অতিশয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে ঐ ক্রোড়পত্রটিকে নিরতিশয় সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে দু'একটি কথা বলে নেওয়া সঙ্গত হবে। এক কালে কবি, লেখক বা সাহিত্যকরাই একটা জাতিকে সঙ্কটকালে সঠিক পথ দেখাতেন। আমাদের

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, ফ্রান্সের রুশো, ভলতেয়ার এর নিদর্শন। কিন্তু বাংলার আজ বড়ই দুর্দিন। এখানে আজ এমন একজনও লেখক বা বুদ্ধিজীবী নেই যিনি কোন প্রকাশনা সংস্থা বা কোন ব্যবসায়ী সংস্থা বা কোন সাম্প্রদায়িক বিদেশী ধর্মীয় সংস্থার কাছে বিক্রীত হননি, তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হননি। সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তার ব্যতিক্রম নন। এইসব লেখক ও সাহিত্যিকগণ আজ তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা হারিয়েছেন। এঁরা আজ সেই সব কথাবার্তাই লেখেন, যা তাঁদের অর্থ প্রদানকারী প্রভুরা লিখতে বলে। বলতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমানে এই সব লেখকরা তাঁদের প্রভুদের নির্দেশে সমাজকে কলুষিত করার কথাই লিখে চলেছেন।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। বর্তমানে 'দেশ' পাক্ষিক পত্রিকায় 'অর্ধেক জীবন' নামে একটি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে সেই 'অর্ধেক জীবন'-এর একটি পর্বে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন যে, ছোট বেলায় একবার সরস্বতী মূর্তি দেখে তাঁর যৌন কামনা জেগে ওঠে এবং তিনি সকলের অলক্ষ্যে সেই সরস্বতী প্রতিমার বুকে হাত দেন ও ঠোঁটে চুমো খান এবং এর ফলে তাঁর শরীরে শিহরণ জাগে। তাঁর এই লেখা পড়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মন কতখানি কলুষিত ও ক্লেদাক্ত হতে পারে, তা অনুমান করা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় হল, কোন্ প্রভুর নির্দেশে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ওই অতিশয় ধিক্কারযোগ্য কথা লিখেছিলেন?

পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, গত ৪ঠা ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। ওই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে ".... যে দেশে নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালেও ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী বন্দনা শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ... ইত্যাদি ইত্যাদি।" কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন সংস্থার কাছে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আপন সত্ত্বাকে বিক্রয় করেছেন বা তিনি কোন সংস্থার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন, যা কোন সংস্থার নির্দেশ মত তিনি এখন কলম ধরেন।

বছর খানেক আগে এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। সকলেরই স্মরণ আছে যে, গত বছর এই সময় শ্রীমতী দীপা মেহতা 'ওয়াটার' ছবির স্যুটিং করতে ভারতে এসেছিলেন এবং কাশীতে স্যুটিং করতে গেলে সেখানকার নাগরিকরা সেই বিকৃতরুচির ছবির স্যুটিং-এ বাধা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলার বাঘা বাঘা রাজনৈতিক নেতৃগণ, রাঘব বোয়াল বুদ্ধিজীবিগণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চিনেপুঁটি বুদ্ধিজীবীর দলও মহা গণ্ডগোল শুরু করে দেন। শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে তাঁরা চীৎকার করে পাড়া মাৎ করতে থাকেন।

তখন কাশীর নাগরিকদের কাজকে ধিক্কার জানিয়ে এবং শ্রীমতী দীপা মেহতাকে স্বাধীনভাবে তাঁর ছবি করতে দেবার দাবি জানিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। মজার কথা হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মৃণাল সেন, অপর্ণা সেন ইত্যাদি ৪০ জন বাঘা বাঘা লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর দল, দীপা মেহতার 'ওয়াটার'-এর চিত্রনাট্যে কি আছে তা না জেনেই শুধু প্রভুর নির্দেশে ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। পরম জ্ঞানী শ্রীমতী অপর্ণা সেন, সেই 'দেশ' পত্রিকাতেই 'কি দিবে তোমারে ধর্ম?' নামে একখানা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে শিল্পীর স্বাধীনতার ব্যাপারটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিছুদিন পরে বর্তমান লেখক যখন ২৮/২/২০০০ তারিখের 'বর্তমান' পত্রিকায় একখানি প্রবন্ধের মাধ্যমে 'ওয়াটার' ছবির বিষয়বস্তু জন সমক্ষে তুলে ধরেন তখন এইসব অর্থলোভী, প্রভুর পদলেহী ঘৃণ্য বুদ্ধিজীবীর দল অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে ফেলে। কারণ নিশাচর জীবদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

শুধু তাই নয়। বর্তমান লেখক এর পর ৩/৪/২০০০ তারিখের 'বর্তমান' পত্রিকায় 'দীপা মেহতার 'ওয়াটার ও বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল' নামে একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে যখন এইসব লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের তাদের কৃতকর্মের জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন, তখনও বুদ্ধিজীবী নামক এই সব নিকৃষ্ট জীবরা অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকেন। বাইরে বেরিয়ে আসার সাহস দেখাতে অসমর্থ হন। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তখন খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা গিয়েছিল যে, এই সব বুদ্ধিজীবীর দল কোন প্রকাশনা সংস্থার পালিত জীব।

এই সব কথাবার্তা থেকে পাঠক যেন মনে না করেন যে, এইসব মহা মহা বুদ্ধিজীবীর দল শুধু মাত্র ওই প্রকাশনা সংস্থারই ক্রীতদাস বা কেনা গোলাম। একজন গণিকা যেমন যে পয়সা ফেলে তাকেই দেহদান করে, এঁরাও তাই। ভাত ছড়ালে যেমন কাকের পাল হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এঁরাও তাই। যে উচ্ছিষ্ট দেবে এঁরা তারই গুণ গাইবেন। আরব থেকে উচ্ছিষ্ট আসে, তাই এঁদের মুখে লেগে আছে ইসলাম ও মুসলমানের প্রশংসা। বাংলাদেশ থেকে উচ্ছিষ্ট আসে, তাই এঁরা প্রচার করে চলেছেন যে বাংলাদেশের হিন্দুরা খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান 'ভাই ভাই' বলে গলাগলি চলছে। কয়েক বছর আগে শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন 'লজ্জা' উপন্যাস লিখে এঁদের গালে ভাল করে চুনকালি প্রলিপ্ত করেছেন। কিন্তু তবুও এঁদের লজ্জা হয় না। সম্প্রতি বাংলাদেশী লেখক শ্রীসালাম আজাদ তাঁর 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে?' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আরও একবার এঁদের গালে আচ্ছা করে পাদুকা ঘর্ষণ করেছেন। সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের মহামান্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্নদাশঙ্কর রায় এ ব্যাপারে সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

কিন্তু শ্রীসালাম আজাদের পাদুকা প্রহার এবার শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের পক্ষেও চুপ করে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। হাত দিয়ে প্রহার-ক্লিষ্ট গাল ঘষতে ঘষতে সালাম আজাদের বইতে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে, এই বই লিখে শ্রীআজাদ খুবই সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

যাই হোক, আনন্দবাজার পত্রিকার ৯ই জানুয়ারীর ক্রোড়পত্রে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'তাতে দোষের কী আছে?' প্রবন্ধে সে সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় লিখেছেন সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। প্রথমেই বলে রাখা উচিত হবে যে, 'তাতে দোষের কি আছে?' শিরোনামটি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিন্তা না করে গ্রহণ করেননি। এর পিছনেও রহস্য আছে। 'তাতে দোষের কি আছে' বাক্যটির ইংরাজী সংস্করণ হল 'So what?', এবং আমেরিকান সংস্কৃতিতে এর ব্যাপক প্রয়োগ আছে। সেখানকার লোকেরা কাঁধ দুটোকে উঁচু করে হাত দুটোকে সামনে টান করে বাড়িয়ে, একটা বিশেষ ভঙ্গীতে (shrug) এই 'So what?' কথাটি উচ্চারণ করে থাকে।

ভোগবাদী ও চূড়ান্ত বস্তুবাদী মার্কিন মুলুকে টাকা পয়সাই আসল বস্তু, আর সবই তুচ্ছ। তাই যে সব ব্যাপারে হাতে টাকা আসে না বা হাত থেকে টাকা যায় না, সে সকল ব্যাপারই তাদের কাছে তুচ্ছ। এই তুচ্ছতা বোঝাতে তারা shrug করে 'So what?' বলে থাকে অমুক বাবুর ছেলে ড্রাগ খেয়ে নেশা করে, So what? অমুকবাবুর মেয়ে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, So what? অমুকের স্ত্রী অমুক ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে গেছে, So what? কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'তাতে দোষের কী আছে' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মাননীয় সুনীলবাবু কোন্ দেশের পাশব সংস্কৃতি ভারতে আমদানি করার চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টার জন্য কোন্ দেশের বা কোন্ দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলো থেকে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছেন।

যাই হোক, প্রবন্ধের শুরুতেই সুনীলবাবু যে গল্পটি শোনাচ্ছেন তা হল, কলকাতার কয়েকটি পাঁচতারা হোটেলে নাকি মাঝে মাঝে ডিস্কো নাচ হয়, ছেলেমেয়েরা টিকিট কেটে সেখানে নাচতে যায়। সুনীলবাবুর পাশের বাড়ীর একটি কলেজে পড়া মেয়ে সেখানে যেতে চায়, কিন্তু মেয়েটির মা তাকে যেতে দিতে রাজী নয়। মেয়েটি লেখাপড়ায় ভাল এবং টিউশনি করে কিছু রোজগারও করে। মা ও মেয়ের তর্কবিতর্কের মধ্যে একটা কথা সুনীলবাবুর কানে বুলেটের মত বিঁধল। মেয়েটি তার মাকে বলছে, 'তোমাদের কাছ থেকে তো টাকা চাইছি না, নিজের টাকাতে যাচ্ছি। তবু তোমাদের আপত্তি কেন?' সেই মার্কিন So what - সংস্কৃতি। মেয়ে নাচতে গেলে যেহেতু মায়ের কোন পয়সা খরচ হচ্ছে না, তাই তাকে বলা উচিত 'So what?' বা এতে দোষের কি আছে? কাজেই কোন নাবালক ছেলে যদি পয়সা

জোগাড় করে তার বাবার সামনেই সিগারেট ধরায় তাহলে সেই বাবার উচিত হবে 'So what?' বলে ব্যাপারটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া কারণ ছেলের সিগারেট খাওয়ার জন্য বাবার পয়সা খরচ হয়নি। তেমনি কারও নাবালিকা কন্যা কোথাও থেকে পয়সা যোগাড় করে বলে অমুক ছেলে বন্ধুর সঙ্গে দীঘায় ছুটি কাটাতে চললাম, তাহলে বাবা-মার পক্ষে তাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না, কারণ এতে তাদের কোন পয়সা খরচ হচ্ছে না। তাদের উচিত হবে 'So what' বলে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে দেওয়া। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন্ দাওয়াই সুনীলবাবু ওই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে খাওয়াতে চাইছেন।

প্রবন্ধের এক জায়গায় সুনীলবাবু লিখছেন, 'যারা ফিল্ম ফেস্টিভেলে যোগ দেয়, গানের জলসা কিংবা কবিতা উৎসবে ভিড় জমায়, যারা বাবা-মায়ের অবহেলায় নেশা-ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে, হোটেলে নাচে, উগ্র পোশাক পরে, তাদেরই ছবি তুলে ধরা হয় বারে বারে। এরা জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। এই অংশটার মধ্যেও কিন্তু অনেকেরই আত্মবিশ্বাস বেশ জোরালো এবং এরাই তো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সভ্যতাকে।' প্রশ্ন জাগে, সভ্যতা বলতে সুনীলবাবু কি বোঝেন। যারা হোটেলে নাচে এবং উগ্র পোশাক পরে, তারাই সভ্যতার অগ্রদূত, সুনীলবাবুর এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেশের মানুষ একমত হবেন বলে মনে হয় না। তবে ওই সব কথাবার্তার মধ্যে যে বিষয়টা পরিষ্কার হয় তা হল, যেহেতু সুনীলবাবু হোটেলে নাচেন না বা উগ্র পোশাক পরেন না, তাই তিনি সভ্যতার অগ্রদূত নন। সম্ভবত এই কারণে তিনি অসভ্যতার অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছেন। দেশের মাতৃজাতিকে এবং নতুন প্রজন্মকে কলুষিত করতে এগিয়ে এসেছেন।

এই সমস্ত ঘৃণ্য ব্যক্তিদের ধিক্কার জানাবার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের অর্থের প্রলোভনে লেখক বা বুদ্ধিজীবী নামধারী এইসব জীবরা পাশ্চাত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারকে ভারতে আমদানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার প্রধান অন্তরায় হল বিগত লক্ষ লক্ষ বছরের সংস্কার। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-উপনিষদের সংস্কার। তাই এক হাতে সভ্যতা ও আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের ব্যভিচার প্রচার করতে হবে এবং অন্য হাতে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির কুৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দেবী সরস্বতীকেও ধর্ষণ করতে হবে।

সুনীলবাবু একা এই কাজে নেমেছেন সেটা ভাবা হবে মারাত্মক ভুল। এক বিশাল চক্র এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছে এবং এই কাজের জন্য পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তারা নিয়মিত উৎকোচ গ্রহণ করে চলেছে। এরা হল বিষাক্ত সাপ এবং সমগ্র সমাজকে বিষাক্ত করার জন্য এরা বিষ উদগার করে চলেছে।

সুনীলবাবু এই চক্রের একটি পালিত জীব মাত্র। তবে মেরুদণ্ডহীন ও অর্থলোভী জীব। এদের মূল প্রচেষ্টা হল সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই দেশের মা-বোনদের কলুষিত করা এবং আধুনিকতার নামে এঁদের লজ্জাবোধকে হরণ করে এঁদে র মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে দেওয়া। পাশ্চাত্যের রমণীদের মত এঁদের লজ্জাহীন পশুতে পরিণত করা।

তাই উল্লিখিত ক্রোড়পত্রের 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্পাদক মহাশয় লিখছেন, "... কলকাতার ক্লাবে যে নাচছে, আর যে বিদেশিনী কুণ্ঠাহীন টু-পিস পরে সুনীল সাগরে হাঁটছে, তারা আসলে একই কন্যা। দুজনের মধ্যেই একটা সহজ সুন্দর কুণ্ঠাহীন জীবনবোধ কাজ করছে। আড়ষ্টতা নেই। অথবা সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখার সংস্কারাচ্ছন্নতা নেই কারও মধ্যে কিংবা বেমানান লজ্জা বা পাপবোধ। বিদেশিনীর সঙ্গে ভারতীয় মেয়েটির কোনও তফাত নেই এখন।" এসব কথার মধ্য দিয়ে সম্পাদক মহাশয় যা বলতে চাইছেন তা হল, আজকের আধুনিক যুগে লজ্জা, সংস্কার ইত্যাদি একেবারেই বেমানান। কাজেই ভারতীয় মেয়েরা, তোমরা কুণ্ঠাহীনভাবে নগ্ন হবার চেষ্টা কর এবং ঐ বিদেশিনীর মতই টু-পিস পরে কুণ্ঠাহীনভাবে সমুদ্রের পারে হাঁট, সমুদ্রস্নান কর।

সকলেরই জানা আছে যে, মানুষেরই লজ্জাবোধ আছে, পশুদের নেই। এটাও সকলেই স্বীকার করবেন যে, পাশ্চাত্যের সমাজে মেয়েদের লজ্জা খুবই কম। তাদের দেশে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সামনে বাবা-মা নগ্ন হয়ে সমুদ্রস্নান করে। কাজেই তারা যে পশুত্বের খুবই নিকটবর্তী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কলকাতার সিনেমা হলগুলোতে যারা বিদেশী ছবি দেখতে ভিড় করে, তার খুব সামান্য কয়েকজনই শিল্পের রস আস্বাদনের জন্য ওই সব ছবি দেখতে যান। বাকী সমস্ত দর্শকরা যান পাশ্চাত্যের পশুত্ব দেখতে, লজ্জাহীন নগ্নতা দেখতে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাজেই সম্পাদক মহাশয়ের প্ররোচনা হল, ভারতীয় বা বাঙালী মেয়েরা, তোমরা ঐ সব অর্ধপশু পাশ্চাত্যের রমণীদের মতই লজ্জা, কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেল। তাদের মত টু-পিস পরে ঘুরে বেড়াও। জীবনটাকে এনজয় কর। তাই তিনি লিখছেন, "এনজয়। এবং ওই একটি শব্দের বাতাস লেগে শুকনো পাতার মত ঝরে যাচ্ছে বাঙালির সেকেলে কুণ্ঠা, পুরানো আড়ষ্টতা, অথবা অন্যায়বোধ। অবশেষে শরীর মনে মুক্ত হচ্ছে বাঙালি। .... পুরানো বাঙালিদের অনেকেই এই মুক্তির স্বাদ পাননি, সাহস নেই তাদের।"

আশা করা যায় যে ভীতু পুরানো বাঙালীরা না পারলেও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মত আধুনিকতার মশালধারীদের ঘরের মা-বোনেরা আধুনিকতার পথে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন।

সাহস দেখাতে পেরেছেন। 'এনজয়' শব্দের বাতাস লেগে তাঁদের বেমানান লজ্জা, সেকেলে কুণ্ঠা, পুরানো আড়ষ্টতা এবং অন্যায়বোধ, পাপবোধ ইত্যাদি শুকনো পাতার মতই ঝরে গেছে। তাই তাঁরা উলঙ্গ হয়ে হোটেলে নাচতে বা টু-পিস পরে সমুদ্র সৈকতে ঘুরে বেড়াতে কোন সঙ্কোচ করেন না। আনন্দবাজারের পাতায় তাঁদের উলঙ্গ হয়ে হোটেলে উদ্দাম নৃত্যরত বা টু-পিস পরে সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণরত দু-একখানা ছবি ছাপিয়ে দিলে খুবই ভাল হত মনে হয়। পাঠকদের তাহলে বুঝতে সুবিধা হত যে, তাঁদের এই আধুনিকতার প্রচার সত্যই আন্তরিক এবং আধুনিকতার পথে এই অভিযান তাঁরা নিজেদের ঘর থেকেই শুরু করেছেন। আশা করা যায় যে, আগামী দিনে এরকম কোন ক্রোড়পত্র বের করার সময় তাঁরা এই বিষয়টা স্মরণ রাখবেন। পাঠকরাও বুঝতে পারবে যে তাঁদের ঘরের মা-বোনেরা 'শরীর মনে মুক্ত হয়েছেন এবং মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন।'

উল্লিখিত ক্রোড়পত্রখানি শেষ হয়েছে অত্যাধুনিক এক মহিলা চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী ঈলীনা বণিক-এর অতিশয় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ 'আসুন, আমরা বড় হই'-এর মধ্য দিয়ে। শ্রীমতী বণিকের প্রবন্ধের মূল কথাই হল, বাঙালী মেয়েরা, তোমরা সবাই উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারিণী হও। পুরানো সমস্ত সংস্কারই হল শেকলের বন্ধন, তাই সেই সব ঝেড়ে ফেলে দাও। আন্তর্জাতিক হও। তাই তিনি লিখছেন, 'হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েরা আজও শতকরা পঁচাশি ভাগ বিয়ে করলে সিঁদুর পরেন, শাঁখা, পলা, লোহা, এ সমস্ত পরেন। পৃথিবীর অন্য অংশের মেয়েরা এসব আচার মানেন না। 'আমরা কেন আন্তর্জাতিক হব না।' প্রবন্ধের পাতায় শ্রীমতী বণিকের একটি ছবিও ছাপানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রীমতী বণিক অতিশয় আধুনিকা এবং তিনি শাঁখা, সিঁদুর, পলা ইত্যাদি পরেন না।

শ্রীমতী বণিকের ছবি দেখে এবং লেখা পড়ে সেই নীলবর্ণ শৃগালের গল্পটিই মনে পড়ে যায়। গল্পের সেই শৃগাল ধোপার নীলের গামলায় পড়ে নীলবর্ণ হয়ে শ্রীমতী বণিকের মতই নীলবর্ণের প্রশংসা করেছিল এবং আর সবাইকে নীলবর্ণ হবার জন্য নীলের গামলায় ডুব দিতে বলেছিল। শ্রীমতী বণিকের বক্তব্য হল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মেয়েরা শাঁখা, সিঁদুর, পলা ইত্যাদি পরেন না, তাই তাঁরা কুসংস্কারমুক্ত ও সুসভ্য। শ্রীমতী বণিক অত দূরে গেলেন কেন? তার ঘরের সামনে যে সব জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়ায় তারাও শাঁখা সিঁদুর পরে না। তাহলে শ্রীমতী বণিকের বিচারে তারাও কুসংস্কারমুক্ত ও সুসভ্য। শ্রীমতী বণিক খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি, তাঁর মা-ঠাকুমা দিদিমা-রা শাঁখা সিঁদুর পরতেন কি না? প্রকৃত সত্য হল, তাঁরা শাঁখা-সিঁদুর পরতেন বলেই আজ শ্রীমতী বণিক তাঁর বাবার নাম, তাঁর পূর্বপুরুষের

নাম একবাক্যে, নির্দ্বিধায় বলতে পারছেন। কিন্তু তিনি নিজে শাঁখা-সিঁদুর ছেড়ে দেবার ফলে তাঁর সন্তানরা অতটা নিঃসন্দেহে তাদের বাবার নাম বলতে পারবে কি না, তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। এ সন্দেহ আরও প্রবল হয় যখন শ্রীমতী বণিক লেখেন, "বাঙালি মেয়ের বিয়ে করা মানেই যেন সে বিক্রি হয়ে গেল। সে প্রেমে পড়তে পারে না পরপুরুষের। বাঙালিদের বাইসেকশুয়াল বা লেসবিয়ান অথবা সমকামী হতে নেই।" বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শ্রীমতী বণিক বিয়ের পরেও অনেক পরপুরুষের প্রেমে পড়েছেন এবং তাদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। কারণ তিনি একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মনের মানুষী। তাই কোন অন্যায় সংস্কার তিনি সমর্থন করেন না, কোন ছেঁদো মূল্যবোধও তাঁকে স্পর্শ করে না। কাজেই তিনি লিখছেন, "একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মনের মানুষী হয়ে কী করে এ সমস্ত অন্যায় সংস্কার সমর্থন করব? আমি বিশ্বাস করি মানুষের শ্রমে, নিষ্ঠায়, সততায়। ছেঁদো মূল্যবোধ আমাকে স্পর্শ করে না।"

শ্রীমতী ঈলীনা বণিক বলতে চাইছেন যে, বাঙালী মেয়েরা বিয়ের পরে বিক্রী হয়ে স্বামীর দাসত্ব করেন এবং এই দাসত্বের চিহ্ন হিসাবেই তাঁরা শাঁখা-সিঁদুর পরেন। তাই ক্রীতদাসীর মানসিকতা সম্পন্ন এইসব অনগ্রসর বাঙালী মেয়েদের ত্রাণকর্ত্রী হিসাবে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। বিয়ের পরেও যে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমে পড়ার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে এই বৈপ্লবিক বাণীর দ্বারা তাঁদের উজ্জীবিত করতেই যেন দেবদূতের মত শ্রীমতী বণিক আবির্ভূতা হয়েছেন।

কিন্তু শ্রীমতী বণিকের হয় তো জানা নেই যে, যেই নারী স্বাধীনতার মহান বাণী পাশ্চাত্য থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন সেই পাশ্চাত্যের নারী সমাজই আজ বাঙালী মেয়েদের মত স্বামীর অনুগত হবার পথে পা বাড়িয়েছেন। অতি সম্প্রতি শ্রীমতী লরা ডয়াল (Laura Doyale) নামে এক মার্কিন গৃহবধূ 'The Surrendered Wife' 'আত্মসমর্পণকারী স্ত্রী' নামে একখানি বই লিখে সমস্ত মার্কিনমুলুকে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

শ্রীমতী ডয়াল তাঁর বইতে লিখেছেন যে, এতকাল নারী স্বাধীনতার নামে আমেরিকার মেয়েরা যা করে এসেছে তার ফলে তাদের কোন উপকার তো হয়ইনি, বরং অনেক ক্ষতি হয়েছে। নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েরা এতদিন যা করেছে তা এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে এবং পরিবারের মূল ভিত্তিই ধ্বংস হয়েছে এবং ১০০০ বিয়ের মধ্যে ৫৩৮টি বিয়ে এক বছরের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। আজ কোন আমেরিকান স্বামীই একবাক্যে বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, তার স্ত্রী যে সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে-ই তার পিতা। শ্রীমতী ডয়ালের

মতে নারী স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই এই পরিবারিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমেরিকার মত বস্তুবাদী সমাজে বসে শ্রীমতী ডয়েল লিখছেন যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে মাসে মাসে কিছু মাসোহারা চেয়ে নেবে হাত খরচের জন্য, এবং এছাড়া স্বামীর হাতেই থাকবে সমস্ত পয়সাকড়ি। শ্রীমতী ডয়াল এ ব্যাপারে এতখানি দৃঢ় যে, স্বামী যদি মদ্যপ হয় বা অন্য কোন মহিলার পিছনে টাকা খরচ করে তবুও সমস্ত টাকা পয়সার নিয়ন্ত্রণ স্বামীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তাকে সুযোগ দিতে হবে ঠিক পথে আসার।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমেরিকার মহিলা সমাজ, যেই সমাজ গত এক শতাব্দী ধরে নারী স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে চলেছে, সেই মহিলা সমাজও শ্রীমতী ডয়ালের বইটি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বেস্ট সেলার বলে যে দশখানা বই মার্কিন বাজারে চলছে, তার মধ্যে শ্রীমতী ডয়ালের বই স্থান করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার বিভিন্ন জায়গার থেকে শ্রীমতী ডয়ালকে এ ব্যাপারে বক্তৃতা করার জন্য ডাকা হচ্ছে। শ্রীমতী ডয়াল 'Power of Surrender' নামে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিক ও ঈলীনা বণিকের মত শিল্পীরা দলবদ্ধভাবে আজ পাশ্চাত্যের নর্দমার নোংরা ফেরি করতে পথে নেমে পড়েছেন। মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাংলার তথা ভারতের নারীজাতিকে কলুষিত করা। আধুনিকতার নামে তাদের মধ্যে যৌনতা ও ব্যভিচার ছড়িয়ে দেওয়া। কোন উচ্ছিষ্টের প্রলোভন ছাড়াই তাঁরা এ কাজে নেমেছেন তা নয়। প্রচুর পরিমাণে উচ্ছিষ্টের বিনিময়েই যে তারা এই কাজে নেমেছেন তা বলাই বাহুল্য।

এক কালে মীর্জাফরের দল উৎকোচের বিনিময়ে বাংলাকে বৃটিশের হাতের তুলে দিয়েছিল। আজকের মীর্জাফরের দল পাশ্চত্যের কাছে গোটা ভারতবর্ষটাই তুলে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এই চক্রান্তের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে পাশ্চাত্যের নর্দমার নোংরা এনে দেশের নতুন প্রজন্মকে কলুষিত করতে উদ্যত হয়েছে। দেশের নারীসমাজকে বিষাক্ত করতে উদ্যত হয়েছে। জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরিয়ে সমাজকে ধসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই দেশের শাশ্বত, সনাতন সংস্কৃতিকে কুসংস্কার বলে ত্যাগ করতে দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে উদ্যত হয়েছে। যে সংস্কৃতি মানুষকে দেবত্বের দিকে নিয়ে যায় সেই সুসভ্য সংস্কৃতিকে পুরানো জঞ্জাল হিসাবে পরিত্যাগ করে পশুবৎ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার জন্য দেশবাসীকে প্ররোচিত করছে। তাই দেশবাসীর আজ উচিত স্বামীজীর সেই

সতর্ক বাণীকে স্মরণ করা। অনেক দিন আগেই স্বামীজী এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলে গিয়েছেন, "তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার দিকে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে।....ফল দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ ধ্বংস"(বি. র.- ৫ : ৪৬)।

কাজেই বাংলার মানুষকে আজ চিন্তা করতে হবে, তারা কি বিবেকানন্দের মত সত্যদ্রষ্টা ঋষির পথে চলবেন, না কি উৎকোচ গ্রহণকারী, আধুনিকতার ধ্বজাধারী ও আত্মবিক্রীত এই সব বিকৃত রুচির সাহিত্যিক বা শিল্পী বা কাগজের সম্পাদকদের কথা অনুসারে চলবেন। তাঁরা কি ত্যাগ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনুসরণ করবেন, না কি ভোগবাদী, বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের 'এনজয়' করার সংস্কৃতিকে অনুসরণ করবেন? তাঁরা কি চক্রান্তকারী, উৎকোচ গ্রহণকারী ও বিকৃতরুচির বুদ্ধিজীবীদের কথামত পাশ্চাত্যের পশুবৎ ভোগবাদী সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দেবেন, না কি সেই কু-চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে এগিয়ে আসবেন?

যাই হোক, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যেমন আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবার প্রথম সোপান হিসাবে, বা নাবালকত্ব কাটিয়ে ওঠার প্রথম ধাপ হিসাবে স্কুলে যৌনশিক্ষার সুপারিশ করেছেন, অতি আধুনিকা শ্রীমতী ঈলীনা বণিকও অন্তিমে সেই একই উপদেশের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রবন্ধখানির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। শ্রীমতী বণিক লিখছেন, "আমাদের স্কুল কলেজে sex educstion থাকা উচিত, বাঙালি সমাজে Sexuality সম্বন্ধে 'ট্যাবু' ভাঙা দরকার সবচেয়ে আগে।" এই মন্তব্যও আনন্দবাজার পত্রিকার উল্লিখিত মন্তব্যের মধ্যেকার সাদৃশ্য এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা একই মালিকের দানাপানি খেয়ে থাকেন। এবং সেই মালিকের সিদ্ধান্ত হল, ভারতীয় সমাজকে অতি দ্রুত কলুষিত করতে হলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষা দেওয়াই একমাত্র পথ।

## স্কুলে যৌনশিক্ষার সপক্ষে আরেক মহিলার ওকালতি

আনন্দবাজার পত্রিকার উপরিউক্ত ৪ঠা ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে সম্পাদক মহাশয় এক জায়গায় আক্ষেপ করে লিখছেন, "দক্ষিণ এবং অংশত পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি সামাজিক উন্নয়নের নানা মাপকাঠিতে অবশিষ্ট ভারতের তুলনায় অগ্রবর্তী। যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রেও যে তাহারাই অগ্রণী হইতে চলিয়াছে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।... এই পশ্চিমবঙ্গ কি এ বিষয়ে পিছনেই পড়িয়া থাকিবে?" তাই মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে আশ্বস্ত করার জন্য বলতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে বিশেষ পিছিয়ে নেই।

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে, ১৯৯৬ সালের ৩০শে নভেম্বর, শনিবার, কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় 'Birds and the Bees' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, লেখিকার নাম শ্রীমতী ঝিমলি মুখার্জী। ওই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, কলকাতার প্রায় সব মিশনারী স্কুলগুলোতেই নিয়মিতভাবে যৌনশিক্ষার ক্লাস তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজেই গত চার বছরে এই প্রচেষ্টা যে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে সরাসারি যৌনশিক্ষা না বলে 'ভ্যালু এডুকেশন' নামে তা পরিবেশন করা হচ্ছে।

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীমতী মুখার্জী এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ দেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনতিবিলম্বে যৌনশিক্ষা চালু করা উচিত। তাঁর মতে আমাদের দেশের মা-বাবারা খুবই রক্ষণশীল। তাই যৌন বিষয়ক যে কোন ব্যাপারই তাদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। কাজেই এই সব ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে ছেলেমেয়েরা তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য তো প্রায়ই না, বরং ধমক - বকুনির শিকার হতে হয়। লেখিকার মতে স্কুলে যৌনশিক্ষাই এর একমাত্র সমাধান। ফলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবে, অথবা যৌন শিক্ষার ক্লাসের শিক্ষক বা শিক্ষিকার পরামর্শ নিতে পারবে।

যৌনশিক্ষা না পাবার ফলে আমাদের মত রক্ষণশীল দেশের ছেলেমেয়েরা কি দুর্গতির শিকার হয়, তাও লেখিকার একটি গল্পের মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখিকার মতে এ ব্যাপারে মেয়েরাই সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন ধরা যাক, সুধা নামের একটি (কাল্পনিক) মেয়ে রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে উঠল, সেখানে সমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে কথা পছন্দ করেন না। তাই তাঁরা সুধাকে একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল বাংলা মিডিয়াম-এর স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ফল হল এই যে, সুধা বয়সেই বড় হল বরং মানসিকাতার দিক দিয়ে কাঁচাই রয়ে গেল।

যথারীতি সুধা স্কুলের গণ্ডি পার করে কলেজে ভর্তি হল, মৌলানা আজাদ কলেজে দর্শনের ছাত্রী হয়ে সে যেন অচেনা জগতে প্রবেশ করল। সেখানেই সে প্রথম ছেলেবন্ধু পেল এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে সুযোগ পেল। কিন্তু যৌন ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার দরুন সে অচিরেই এক ছেলেবন্ধুর শিকারে পরিণত হল এবং অন্তঃসত্ত্বা হল। বাবা-মা'র কাছ থেকে সে কোন সাহায্যই পেল না। বরং তাঁরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই ছেলেবন্ধুও তার পিতৃত্ব অস্বীকার করল এবং শেষ পর্যন্ত সুধাকে আত্মহত্যার করুণ পথই বেছে নিতে হল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও লেখিকা শ্রীমতী মুখার্জি কিছুটা সন্তুষ্ট এই জন্য যে, মিশনারী স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষগণ, ফাদারগণ ও নান্‌গণ এই চূড়ান্ত অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে

নেমে পড়েছেন। তাঁদের স্কুলগুলিতে অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা নিয়মিত মহোপকারী যৌনশিক্ষা দিতে শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁরা ভিডিও ক্যাসেটও ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

শ্রীমতী ঝিমলি মুখার্জি তাঁর উপরিউক্ত নিবন্ধে কতিপয় স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষিকা, কতিপয় অভিভাবিকা ও কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রীর সাক্ষ্যও উপস্থিত করেছেন। এঁদের সকলেরই এক মত, তা হল যৌনশিক্ষার মত উপকারী এ জগতে আর কিছুই নেই। তাই অবিলম্বে সব স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে এই শিক্ষা চালু করা উচিত।

মিডল্‌টন্‌ রো-তে অবস্থিত 'লরেটো হাউস স্কুল'-এর প্রিন্সিপাল সিস্টার অনিতার মত হল, স্কুলে যৌনশিক্ষা দিলে ছাত্রছাত্রীদের যৌন ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল দূর হবে। অহেতুক কৌতূহলের বদলে তারা যৌন ব্যাপারে ভাল মন্দ সবই জানতে পারবে। ফলে আশা করা যায় তারা ভবিষ্যতে অনেক কম ভুল করবে। সিস্টার অনিতার মত হল, খুব অল্প বয়স থেকেই ছাত্রছাত্রীদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, ক্লাস ফাইভ বা তার অগে থেকেই তাদের এই শিক্ষা দিতে হবে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপাল, ফাদার পি সি ম্যাথু-র মত হল, আজকাল ছেলেমেয়েরা অনেক ছোট বয়স থেকেই নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে দেয়, যা আগেকার দিনে ভাবা যেত না। তার থেকে বোঝা যায় যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক কম বয়সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে ফাদার ম্যাথু খবরের কাগজ, বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও টিভিকে দায়ী করেন। এই সব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুই ভুল জানে ও ভুল শিখে। এই কারণেই অনেক অল্প বয়স থেকেই তাদের যৌনশিক্ষা দেওয়া দরকার, যাতে তারা ভুল শিক্ষার খপ্পরে না পড়ে। এই শিক্ষা তাদের খুব ভাল ভাবেই দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে তারা ভুল করে না বসে।

ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের জনৈক শিক্ষক জানান যে, যদিও তারা এখনও নিয়মিত যৌনশিক্ষার ক্লাস শুরু করে উঠতে পারেননি, তবুও চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে যত শীঘ্র সম্ভব এই শিক্ষা তাঁরা নিয়মিতভাবে চালু করতে পারেন। "কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা পেয়ে প্রভূতভাবে উপকৃত হচ্ছে।"

লা মার্টিনীয়ার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীনবনীতা থামান বলেন, "স্বস্তির কথা হল এই যে, ছাত্রছাত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করার বা পরামর্শ করার একটু জায়গা পেয়েছে। .... আমি এখনও আমার বাবা-মার সামনে সাবলীলভাবে যৌন বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি না, আড়ষ্টতা অনুভব করি। .... যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যৌনক্লাস শুরু করা গেছে। ফলে তাদের আড়ষ্টতা

কমবে আশা করা যায়।'' তিনি দুঃখ করে আরও বলেন, যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটা স্কুলের মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রীই আজ কেবল এই সুযোগ পাচ্ছে এবং বৃহত্তর ছাত্রসমাজ বঞ্চিত হয়ে চলেছে।

ইন্দ্রাণী ঘোষ নামে জনৈকা শিক্ষিকা বলেন যে, আজকাল বেশ কিছু স্কুলের কর্তৃপক্ষই যৌনশিক্ষার বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করছে। আমাদের সময় এসব ব্যাপারে কোন কথাই বলা চলত না। তাই বিরাজ করত চরম অজ্ঞতা। আজ দিনকাল বদলে গিয়েছে, তাই এ সব বিষয় চেপে রখা ঠিক নয়। যৌনশিক্ষার মধ্য দিয়ে এই সব বিষয় ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেওয়াই সঙ্গত।

অভিভাবিকা শ্রীমতী শুভা সরকার বলেন যে, তিনিও একজন রক্ষণশীল মা, কারণ রক্ষণশীল পরিবেশেরে মধ্য দিয়েই তিনি বড় হয়েছেন। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানে, যা তিনি নিজেও জানেন না। তাই তিনি তাঁর মেয়ের কাছ থেকে আজ অনেক কিছুই শিখে নিতে বাধ্য হন। যৌন বিষয়েও তাঁর মেয়েরা তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে। স্কুলে যৌনশিক্ষা পাবার ফলেই তাদের পক্ষে এত খোলামেলাভাবে এসব কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। তাই শ্রীমতী শুভা সরকার-এর মত হল, স্কুলে যৌনশিক্ষা একান্ত জরুরী এবং তা খুবই ভাল জিনিস।

মনোরোগ বিজ্ঞানী ডাঃ রূপা ঘোষ জানান যে, স্কুলে ছাত্রছাত্রীদর যৌনশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ আজকাল কম বয়সেই ছেলেমেয়েদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা মাত্র দশ বছর আগেও ছিল না। তাদের অবশ্যই বাস্তব জগতের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দরকার। আজকাল বাচ্চাদেরও বয়স্কদের মতই দেখতে হবে এবং তাদের প্রশ্ন ও কৌতূহলের সঠিক জবাব দিতে হবে।

কাজেই শ্রীমতী ঝিমলি মুখার্জির প্রবন্ধের সারমর্ম এটাই দাঁড়ায় যে, টিভি ও সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক কম বয়সেই অনেক বেশি জেনে ফেলছে। তাই তাদের জানাকে সমৃদ্ধ করতে ও কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে তাদের যৌনশিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। খুব কম বয়স থেকেই এই শিক্ষা দিতে হবে এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকেই এই মহা উপকারী শিক্ষা শুরু করা দরকার।

## আমেরিকার স্কুলে যৌনশিক্ষার বিষময় ফল ঃ

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, যেই শনিবার শ্রীমতী ঝিলমিল মুখার্জির প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ঠিক তার পরের দিন, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৬, রবিবার, ওই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতেই 'Teenagers' Sex Dilemma' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, লেখক ডঃ এন ডি বাত্রা। ডঃ বাত্রা আমেরিকার 'ভারমন্ট' রাজ্যের 'নরউইচ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক এবং ঐ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমেরিকা

স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌন শিক্ষার করুণ ও ভয়াবহ পরিণতির কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন।

ডঃ বাত্রা জানালেন যে, ১৯৬৪ সালে আমেরিকার কিছু শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবী মিলে 'সেক্স ইনফরমেশন এ্যান্ড এডুকেশন কাউন্সিল' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আমেরিকার সকল স্তরের ও সকল বয়সের নারীদের পক্ষে যৌন শিক্ষা একান্তভাবে জরুরী, এবং ওই যৌনশিক্ষা স্কুল স্তর থেকেই করা দরকার। মার্কিন সরকার এই অভিমতকে মান্যতা দিলে আমেরিকার স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে যৌনশিক্ষা শুরু হয়। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কিভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হবে উপরিউক্ত সংস্থাই তার নীতি নির্ধারণ করে দেয় এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে দেয়।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, বহুমুখী কল্যাণকর হিসাবে যে যৌনশিক্ষা শুরু হয়েছিল, তা অত্যন্ত সীমিত গণ্ডির যৌনশিক্ষায় পরিণত হয়েছে। শুধু মাটি দিয়ে আপন আপন যৌনাঙ্গ গঠন এবং শশার সাহায্যে কনডোম ব্যবহারের শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। উপরন্তু সেই যৌনশিক্ষা শুধু শিক্ষা নয়, ব্যবহারিক যৌনচর্চায় পরিণত হয়েছে। যৌনশিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমিলনের ঘটনাই শুধু বাড়েনি, অল্পবয়সী মেয়েরা যৌনশিক্ষার ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়ের কামনার শিকারেও পরিণত হচ্ছে।

ফলে দেখা গেল বিশ-অনুত্তীর্ণ (teenager) মেয়েদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং এদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েই কোনরকম সাবধানতা না অবলম্বন করেই যৌনমিলন করেছে। ফলে হু হু করে বাড়তে লাগল নাবালিকাদের মধ্যে অবৈধ সন্তান ধারণের ঘটনা। সমীক্ষায় দেখা গেল যে, ৪০ শতাংশ ছাত্রী কুড়িতে পৌঁছবার আগে অন্ততপক্ষে একবার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অধিকারী হচ্ছে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেল যে, ১৯৯৬ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছরের মেয়েরা প্রায় দশ লক্ষ অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ইতিমধ্যে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে 'The Social Organization of Sexuality' নামে এক ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতেও একই চিত্র ফুটে উঠে এবং দেখা যায় যে, ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

পরিস্থিতির সুযোগ নিতে প্রতিটি স্কুল চত্বরের আশেপাশে গজিয়ে ওঠে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য গর্ভপাতের ক্লিনিক আর বাচ্চা রাখার ক্রেশ। গর্ভপাতের ক্লিনিকগুলোতে মেয়েরা মা-বাবার অজান্তে গর্ভপাত করাতে লাগল এবং নানারকম

হয়রানির শিকার হতে লাগল। আর যারা মা হয়ে গেছে তারা ক্রেশগুলোতে বাচ্চা রেখে ক্লাস করতে লাগল। এরকম একটি ১২ বছরের স্কুল ছাত্রীকে তার দ্বিতীয় সন্তান কোলে করে স্কুলে যেতে দেখে এক মার্কিন সাংবাদিক লিখল, 'It is very amusing to see a 12 year school-girl carrying her second baby."

কিন্তু মার্কিন সরকার বা রাজনৈতিক নেতারা দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকলেন। কারণ অল্পবয়সী এইসব ছাত্রছাত্রীরা তখনও ভোটার হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে নিউজার্সি রাজ্যে একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে সমস্ত আমেরিকা জুড়ে এক বিরাট তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হল।

ওই রাজ্যের এক সচ্ছল পরিবারের ছেলে ব্রায়ান সি পিটারসনের বান্ধবীর নাম অ্যামী এস গ্রসবার্গ। অ্যামী গ্রসবার্গও এক ধনী পরিবারের কন্যা। কুমারী গ্রসবার্গ ইউনিভারসিটি অফ ডেলাওয়ার ছাত্রী এবং ব্রায়ান পেনসিলভানিয়ার গেটিসবার্গ কলেজের ছাত্র। দুজনের বয়সই ১৮ বছর এবং মেলামেশার ফলে অ্যামী অন্তঃসত্ত্বা হয়। ক্রমে প্রসবের সময় উপস্থিত হল। গত ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর ব্রায়ান অ্যমীর ডরমিটোরী থেকে তাকে তুলে নিয়ে এক মোটেলে গিয়ে হাজির হল। সেখানেই অ্যামী সন্তান প্রসব করল। ১৮ বছর বয়সী বাবা ঠিক করতে পারল না যে ঐ পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। শেষ পর্যন্ত একটা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে নবজাত শিশুটিকে ভরে নিকটবর্তী একটি ময়লা ফেলার ড্রামে ফেলে দিয়ে তারা মোটেল ছেড়ে চলে এল।

ব্যাপারটা হয়তো গোপনই থেকে যেত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অ্যানীর অন্য কিছু মেয়েলী সমস্যা দেখা দিল এবং চিকিৎসার জন্য ব্রায়ান তাকে একটা হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ডাক্তাররা অ্যামীকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারল যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সে সন্তান প্রসব করেছে। সন্দেহ হতে ডাক্তাররা পুলিশকে খবর দিল এবং পুলিশের জেরার কাছে অ্যামী ব্রায়ান সব ঘটনা স্বীকার করল। পুলিশ যখন সেই সদ্যজাত শিশুটিকে খুঁজে বার করল তখন দেখা গেল সে মারা গেছে। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে শিশুটি মারা গিয়েছে। তাই ব্রায়ানী নরহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হল। কিন্তু ১৮ বছরের ব্রায়ানকে বিচারক নরহত্যার সেই সাজা দিতে পারেন কিনা তাই নিয়ে সারা আমেরিকা জুড়ে ঝড় বইতে শুরু করে দিল।

যাই হোক, এই ঘটনার পর অল্পবয়সীদের সমস্যার ব্যাপারে সরকারের পক্ষে নীরব দর্শক হয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। বছরে ১০০ কোটি ডলারের এক বাজেট তৈরি হল, বিনা পয়সায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গর্ভনিরোধক বড়ি ও কনডোম বিতরণের জন্য এবং সরকারি খরচে গর্ভপাত করাবার অসংখ্য ক্লিনিক খোলার জন্য। এছাড়া

প্রত্যেক স্কুলে সরকারি খরচে তৈরি করা হল বাচ্চা রাখার ক্রেশ যাতে ছাত্রীরা সেখানে বাচ্চা রেখে নিশ্চিন্তে ক্লাস করতে পারে এবং দুই ক্লাসের ফাঁকে শিশুকে স্তন্য পান করাতে পারে।

আগে আশা করা হয়েছিল যে, ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক যৌনশিক্ষা দিলে অন্যান্য বিষয়েও তাদের শিক্ষার মান বাড়বে। কিন্তু ফল দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি কোন বিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান একটুও বাড়েনি, বরং কমেছে।

যৌনশিক্ষার সপক্ষে আগে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, এই শিক্ষা পেলে ছাত্রছাত্রীরা এডস্ ইত্যাদি যৌন-বাহিত ব্যাধি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, যৌনশিক্ষা দেবার ফলে অল্পবয়সী টিন-এজারদের মধ্যে এডস্ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমেরিকার পরিবার নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ১৯৮৬ সালের রিপোর্ট (Family Planning perspective, 1986) এ দুটি বিশেষ গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হল। তাতে বলা হল যে, যেসব ছাত্রছাত্রীদের অল্পবয়সে যৌনশিক্ষা দেওয়া হয়েছে, শিক্ষা না পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের থেকে তাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক (Casual) যৌনমিলন ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের ঘটনার হার অনেক বেশি। ওই রিপোর্টে আরও বলা হল যে, আমেরিকায় যৌনশিক্ষা যে বিফল হয়েছে তাই নয়, যে ভাবে ঐ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ফলে তাদের মধ্যে যৌনবিষয়ে উৎসাহ, যৌন অপরাধ, যৌনক্রিয়া, গর্ভপাত এবং যৌন-বাহিত রোগ (STD)-এর সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে সব মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমেরিকার স্কুলগুলিতে যৌনশিক্ষা চালু করা হয়েছিল তার কোনটাই সফল হয়নি, বরং তা অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাই আজ আমেরিকার চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সামাজসেবীদের প্রায় সকলেই বলতে শুরু করেছেন যে, যৌনশিক্ষা নয়, একমাত্র আত্মসংযম ও লজ্জাবোধই আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে পারে। একমাত্র আত্মসংযমই পারে অল্পবয়সীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, অত্যধিক মদ্যপান, যৌনরোগ, ড্রাগ সেবন, দুরন্ত বেগে গাড়ী চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো ইত্যাদিকে কমিয়ে আনতে। তাঁরা আজ আরও বলছেন যে, আত্মসংযমের কথা শুধু মুখে বললেই হবে না। বড়দেরও আত্মসংযম অভ্যাস করতে হবে এবং আত্মসংযমের একটা সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

তাঁরা আরও বলছেন যে, অল্পবয়সের ছাত্রছাত্রীদের দিতেহবে নৈতিক (moral) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual) শিক্ষা, শেখাতে হবে যোগ এবং ধ্যান (meditation) এবং এই সব শিক্ষার মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে আত্মসংযম অঙ্কুরিত হবে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আমাদের মুনি-ঋষিরা এই মানব জীবনের জন্য ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের কথা বলে গিয়েছেন এবং ব্রহ্মচর্যকেই শিক্ষার্থীদের আশ্রম হিসাবে নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আজকের মার্কিন চিন্তাবিদ্‌গণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকারান্তরে সেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন "In the matter of sex, teenagers must be told, Just don't do it" অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের শুধু এটুকুই বলতে হবে, "এটা করো না।" সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নানাবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদ্‌গণ যে সত্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করছেন, আমাদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বহু যুগ আগেই সেই সত্যে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভোগবাদের মধ্যদিয়ে মানুষের কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিলে সেই আগুনে মানুষ নিজেই পুড়ে মরবে। তাই তাঁরা ভোগের বদলে ত্যাগের আদর্শই প্রচার করে গেছেন। 'তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'-র মন্ত্রই তাঁরা শুনিয়ে গিয়েছেন। আজ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও বুঝতে পারছেন যে, ভোগ নয়, ত্যাগের পথই কল্যাণের পথ। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলে গিয়েছেন যে, আমাদের মুনিঋষিরা কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা বুঝতে পাশ্চাত্যের আরও কয়েক শ বছর লাগবে।

## বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, শ্রীমতী ঝিমলি মুখার্জী, শ্রীমতী ঈলীনা বাণিক, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় ইত্যাদি ব্যক্তিরা আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আজ পাশ্চাত্যের যে ওষুধ খাওয়াতে চাইছেন তা ৩০ বছরের পুরানো এবং পরিত্যক্ত। অথচ সকলেই স্বীকার করবেন যে, বিদেশ থেকে কিছু আমদানী করতে হলে সর্বাধুনিক মডেলটাই আমদানি করা সঙ্গত এবং সেই সর্বাধুনিক মডেলটা যৌনশিক্ষা নয়, তা হল নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং আত্মসংযমের শিক্ষা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার পোষা লেখক-বুদ্ধিজীবী বা বুদ্ধি-ব্যবসায়ীর দল ৩০ বছরের পুরানো যৌনশিক্ষার মডেলটা আমদানী করার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন? তাঁরা কি জানেন না যে, এই যৌনশিক্ষার অন্তিম পরিণাম আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কত বিষময় ও কত ভয়াবহ হয়েছে? আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দেশ-বিদেশের এত খবর রাখেন, আর এই খবরটা

রাখেন না, তা বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সব জেনে বুঝেই তাঁরা যৌনশিক্ষার বিষবৃক্ষ এই বাংলা তথা ভারতের মাটিতে রোপণ করতে উদ্যত হয়েছেন এবং তার জন্য প্রচারে নেমে পড়েছেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ দেশে যৌনশিক্ষা চালু করার ব্যাপারে এক কু-চক্র কাজ করে চলেছে এবং আনন্দবাজার পত্রিকাও সেই চক্রান্তে সামিল হয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত হবে যে, মুক্তবাণিজ্য ও বিশ্বায়নের নামে আজ পাশ্চাত্যের বহুজাতিক কোম্পনীগুলির জন্য ভারতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব কোম্পানীগুলোর মধ্যে এমন বহু কোম্পানী আছে যাদের বাৎসরিক ব্যালান্সশিট বা আয়-ব্যয়ের হিসাব অনেক দেশের বাজেট থেকেও বড়। কাজেই এই সব কোম্পানীগুলোর পক্ষে উৎকোচের মধ্য দিয়ে সেই সব দেশের সরকারকে কিনে ফেলাও কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। তাই আনন্দবাজারের মত একটা প্রকাশনা সংস্থাকে উৎকোচ দিয়ে কিনে ফেলা বা বশ করা কোন ব্যাপারই না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, এই সব কোম্পানীগুলোই এককালে আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে উৎকোচ দিয়ে বশ করে সেখানে যৌনশিক্ষার সপক্ষে জনমত তৈরি করেছিল এবং রাজনীতিকদের উৎকোচ দিয়ে যৌনশিক্ষার সপক্ষে সরকারি অনুমোদন আদায় করেছিল।

যাই হোক, এসব বিদেশী কোম্পনীগুলো ভারতে এসেছে, ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করেছে পণ্য তৈরি করার জন্য এবং সেই পণ্য বিক্রী করে লাভ করার জন্য। ভারতের মানুষের কিসে উপকার হবে বা কিসে অপকার হবে তা বিচার করতে নয়। তারা যদি দেখে যে, ভারতের সব মেয়েকে বেশ্যায় পরিণত করলে এক বোতল কোকাকোলা বেশি বিক্রী হবে, তবে তারা তাই করবে; তারা যদি দেখে ভারতের সব গৃহবধূকে ব্যভিচারিণী করতে পারলে এক বোতল পেপসী বেশি বিক্রী হবে, তবে তারা তাই করবে; তারা যদি দেখে ভারতের সমগ্র যুব সমাজকে চরিত্রহীন তৈরি করলে তাদের নুডল এক প্যাকেট বেশি বিক্রী হবে, তবে তারা তাই করবে। তারা যদি দেখে যে ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা তথা সমাজ ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারলে একটা চকোলেট বেশি বিক্রী হবে, তবে তারা তাই করবে। তারা যদি দেখে যে, ভারতীয়দের মধ্যে অনাদি কাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারগুলোকে দূর করতে পারলে একটা সাবান বেশি বিক্রী হবে, তবে তারা তাই করবে। একেই বলে কনজিউমারিজম। মানুষ কোন সঞ্চয় করবে না বা ঘরবাড়ী বানাবার চেষ্টা করবে না। শুধু খাবার জিনিস কিনে খাবে, পরার জিনিস কিনে পরবে, গাড়ী কিনে গাড়ী চড়বে। দেশের কথা, জাতির কথা,

ধর্মের কথা, ন্যায়নীতির কথা ভুলে যাবে। তারা শুধু শারীরিক ভোগই বুঝবে, শারীরিক ভোগই খুঁজবে, শারীরিক ভোগে মত্ত হবে, ফূর্তি করবে। তবেই তো ভারতে কনজিউমারিজম সফল হবে। এক কথায়, ভারতের মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে পশুত্বে নামিয়ে আনতে হবে, তবেই ভারতে কনজিউমারিজম্ সফল হবে।

এইভাবে ভারতের মাটিতে অর্থনৈতিক আক্রমণের (geo-economic aggression) এর সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে সাংস্কৃতিক আক্রমণ (geo-cultural aggression) এবং এই দুই আক্রমণের দ্বারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে, সনাতন মূল্যবোধকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। পুরাণো মূল্যবোধকে ভেঙেচুরে ভারতীয় সমাজকে পাশ্চাত্যের Skin-deep সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ভারতবাসীর মন থেকে আধ্যাত্মিকতাকে উৎপাটন করে সেখানে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদকে বসিয়ে দিতে হবে, তবেই ভারতে কনজিউমারিজম্ সফল হবে।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতে কনজিউমারিজমের সাফল্যের প্রধান অন্তরায় হল ভারতীয় মর্মমূলে নিহিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংস্কার, দেবদেবীতে ভক্তি, যুগ যুগ ধরে চলে আসা এবং মুনি-ঋষিদের দ্বারা প্রবর্তিত মূল্যবোধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও সম্মান; রামায়ণ, মহাভারত ও বেদ-উপনিষদের সংস্কার এবং সর্বোপরি নারীজাতির সতীত্বের সংস্কার। আরও একটু তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কার সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতের নারী জাতিই যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে এসেছে। বর্বর মুসলমানদের আক্রমণের সময় ভারতীয় নারীই জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সেই সনাতন সংস্কারকে রক্ষা করেছে। সুতরাং ভারতীয় সমাজকে নষ্ট করতে হলে সবার আগে নষ্ট করতে হবে ভারতীয় নারীকে।

কিন্তু এই কাজ তো নিজেদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই এর জন্য ভারতীয় দালাল নিযুক্ত করতে হবে। আনন্দবাজার পত্রিকার মত প্রচার সংস্থাকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত লেখককে এবং ঈশীনা বণিকের মত মেয়েমানুষকে দালাল নিযুক্ত করতে হবে। উৎকোচের বিনিময়ে দালাল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেবী সরস্বতীকে অপমানিত করে আধ্যাত্মিক সংস্কারকে আঘাত করতে থাকবে। পাশ্চাত্যের 'so what' সংস্কৃতি প্রচার করে সনাতন সমস্ত সংস্কারকে জঞ্জালের মত পরিত্যাগ করার কথা বলতে থাকবে। পয়সা দিয়ে কেনা দালাল আনন্দবাজারের সম্পাদক পাশ্চাতের 'এনজয়' করার সংস্কৃতি প্রচার করতে থাকবে। যুব সমাজকে কলুষিত করার জন্য, বিশেষ করে নারী জাতিকে নষ্ট করার জন্য স্কুলে যৌনশিক্ষার কথা প্রচার করতে থাকবে। পয়সা দিয়ে কেনা দালাল, ঈশীনা বণিকের মত মেয়েমানুষরা আধুনিকতার নামে ভারতীয় নারী সমাজকে ব্যভিচারিণী হবার কথা

বলতে থাকবে এবং এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দেবার কথা প্রচার করতে থাকবে। এভাবেই কাজ এগিয়ে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

সেই সঙ্গে আমাদের মত বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পক্ষে যা করা সম্ভব তা-ও করে যেতে হবে। যত পারা যায় ভারতীয় মেয়েদের বিশ্বসুন্দরী বানাতে হবে। তাদের সাঁতারের পোশাক পরিয়ে হাঁটাতে হবে এবং সেই ছবি টিভিতে প্রচার করতে হবে। তাদের নগ্ন ছবি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছাপাতে হবে। শহরে শহরে ঘন ঘন ফ্যাশন প্যারেড করতে হবে। সেখানে ভারতীয় মেয়েদের নগ্ন করে হাঁটাতে হবে। এভাবে ভারতীয় নারী সমাজের মধ্য থেকে লজ্জাবোধকে হত্যা করতে হবে।

এই কাজে এডস্ রোগ এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করেছে। যদিও ভারতে এডস্ রোগে যত লোক মারা যায়, সামান্য পেটের অসুখে তার থেকে দশগুণ বেশি লোক মারা যায়* তবুও এডস্ এর এক কাল্পনিক মহামারীর চিত্র প্রচার করতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে যৌনতা প্রচার করতে হবে। তা ছাড়া প্রচার চালাতে হবে যে, একমাত্র স্কুলে যৌনশিক্ষাই এডস্ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। সর্বোপরি, একমাত্র স্কুলে যৌনশিক্ষাই উপরিউক্ত সমস্ত কাজকে অতিশয় ত্বরান্বিত করতে পারে। তাই দালাল বুদ্ধিজীবী ও প্রচার সংস্থাগুলোকে দিয়ে স্কুলে যৌনশিক্ষার সপক্ষে প্রচার চালাতে হবে এবং জনমত তৈরি করতে হবে।

এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদেরই সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষা দেবে সেই স্কুলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠাবেন না। সেই স্কুলকে তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে বয়কট করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা সংঘবদ্ধভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষকেও আগাম জানিয়ে দেবেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আরও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যেই সব পত্র-পত্রিকায় বা খবরের কাগজে স্কুলে যৌনশিক্ষার সপক্ষে মতামত বা সুপারিশ প্রকাশিত হবে, সেই সব খববের কাগজকে তাঁরা বয়কট করবেন। যেই সব পত্রপত্রিকায় কুরুচিকর ছবি ছাপা হবে, কুরুচকির প্রবন্ধ ছাপা হবে অথবা আধুনিকতার নামে নারী জাতিকে কলুষিত করার মত নিবন্ধ ছাপা হবে সেই সব পত্র পত্রিকা তাঁরা বয়কট করবেন। তবেই নতুন প্রজন্মকে কলুষিত করার এই চক্রান্তকে প্রতিহত করা যাবে।

---

* গত ১৯৯২ সালে ভারতে যত লোক মারা যায় তার মধ্যে কত লোক কি ভাবে মারা যায় তার শতকরা হিসাব—

| | |
|---|---|
| দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনা জনিত আঘাত - | ৮.৫ |
| প্রসব ও সন্তানধারণ— | ১.০ |
| সাধারণ জ্বর — | ৭.৭ |
| পেটের অসুখ ও বদ হজম | ৬.২ |
| ফুসফুস ও শ্বসন যন্ত্রের রোগ | ১৯.২ |
| বিভিন্ন স্নায়ুঘটিত রোগ | ৪.৫ |
| রক্ত সঞ্চালন জনিত রোগ | ১০.৮ |
| বিভিন্ন শিশুরোগ | ৯.৬ |
| বার্ধক্য জনিত রোগ | ২৩.৫ |
| অন্যান্য | ৮.৪ |

উৎস : Manpower Pofile India (1997)

## পরিশিষ্ট - ১

### আমাদের চিন্তাবিদ্‌গণ স্কুলে যৌনশিক্ষার বিরোধী

গত ২৭শে, ২০০০ যাদবপুরের 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষার বিষয়ে 'ইন্দুমতী সভাগৃহ'-এ সারাদিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। রাজ্যের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত ১৩ জন উপাচার্য, বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, মনরোগ বিশেষজ্ঞ, পুলিশের দুই বড়কর্তা এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ওই কর্মশালায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। এ ড়া বেশ কয়েকটি সমাজসেবী সংস্থা (এন জি ও) এবং বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরাও ়াদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সর্বশ্রী সুশীল মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ভাস্কর রায়চৌধুরী, বাসুদেব বর্মণ, দিলীপ কুমার সিংহ ইত্যাদি সকল উপাচার্যগণই যৌনশিক্ষার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিদ্ শ্রীপবিত্র সরকার, ডাক্তার শ্রীমতী আরতি বসু সেনগুপ্ত এবং পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রীনারায়ণ ঘোষও যৌনশিক্ষার বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখেন। সপক্ষে বক্তব্য রাখেন মাত্র একজন মনোবিজ্ঞানী ও দু একটি তথাকথিত প্রগতিশীল সমাজসেবী সংস্থার সদস্যগণ।

## পরিশিষ্ট - ২

### যৌনশিক্ষা বানাম যৌন-অশিক্ষা

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কি অবশেষে প্রাপ্তবয়স্ক হইতে চলিয়াছে? সম্ভবত হ্যাঁ, কারণ যে কাজটি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও তাহার সহকারী সংস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং (এন সি ই আর টি) বহু দিনের চেষ্টাতেও

করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাই আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং জাতীয় এডস্ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এন এ সি ও)-র প্রচেষ্টায় সম্ভব হইতে চলিয়াছে। তাহাদের প্রয়াসের ফলেই দেশের ছয়টি রাজ্য— অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ অদূর ভবিষ্যতে পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চলিয়াছে। আপাতত এই শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে শুধু নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বিশেষ ভাবে প্রণীত একটি নির্দেশ পুস্তিকার মাধ্যমে তাহাদের শেখানো হইবে যৌনাচরণ ও প্রজনন সংক্রান্ত বিবিধ শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, ঘুচানো হইবে সেই সব ভ্রান্ত ধারণা যাহা যৌন শিক্ষা ও সচেতনতার একটি সুস্থ পরিমণ্ডলের অভাবে যুবসমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্কহীনতা যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যে দেশে নূতন সহস্রাব্দের প্রাক্কালেও ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী বন্দনা শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন সরকারের কর্তাব্যক্তিরা, সে দেশে এই নূতন উদ্যোগ যে বৈপ্লবিক, সে সম্পর্কেসংশয় থাকিতে পারে না।

যে উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল, তাহা এত বিলম্বে আরম্ভ হইল কেন? এই প্রশ্নের একটি উত্তর অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্যে। পুণ্যভূমি ভারতে যৌনশিক্ষার আয়োজন সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির সারাৎসারটিকে অপবিত্র করিবে—ইহা যদি সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকদের দীর্ঘমেয়াদি বক্তব্য হয়, তবে তাহার প্রতিধ্বনি ক'বছর আগে শোনা গিয়াছিল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতিকদের মুখেও। সংস্কৃতির এই স্বনিযুক্ত দ্বাররক্ষকদের পাল্লায় পড়িয়া অতীতে স্কুল পাঠ্যক্রমে যৌনশিক্ষাকে ঠাঁই দিবার জন্য এন সি ই আর টি'র একাধিক উদ্যোগের দফারফা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে অরক্ষিত যৌন সংসর্গের ফলে এডসের মতো যে মারণব্যাধি সমগ্র বিশ্বেই তাহার কালান্তক ছায়া বিস্তার করিয়াছে, উপমহাদেশের রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধই তাহার বিরুদ্ধেএক সুরক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করিবে। এ আশা সুদূরপরাহতই থাকিয়া গিয়াছে, এডসের কৃষ্ণচ্ছায়া আজ দক্ষিণ এশিয়াতেও সমানভাবে প্রসারিত।

ভারতে নিরক্ষরতা, দারিদ্র ও লিঙ্গবৈষম্যের ত্র্যহস্পর্শের পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখিলে এ সংকটের স্বরূপ আরওই প্রকট হইয়া ওঠে। তাই যৌনশিক্ষার আয়োজন এ দেশে আজ অপরিহার্য, শুধু এডস্ প্রতিরোধের প্রকরণ হিসাবেই নহে, শারীরসংস্থান ও যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধির জরুরি লক্ষ্যেও, জন্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য সহায়ক হিসাবেও। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম যৌনসংসর্গের গড় বয়স কুড়ি— এই সমীক্ষালব্ধ তথ্যটি মাথায় রাখিলে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য যৌনশিক্ষার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও অবিসংবাদিত। দক্ষিণ এবং অংশত পশ্চিম

ভারতের রাজ্যগুলি সামাজিক উন্নয়নের নানা মাপকাঠিতে অবশিষ্ট ভারতের তুলনায় অগ্রবর্তী। যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রেও যে তাহারাই অগ্রণী হইতে চলিয়াছে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর ভারত দূরস্থান, আধুনিকতার গর্বে সদাগর্বিত এই পশ্চিমবঙ্গ কি এ বিষয়ে পিছনেই পড়িয়া থাকিবে? এই রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা মান্ধাতা আমলের, বহু বিষয়ের পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ অচল, অবান্তর। এই সামগ্রিক পশ্চাদ্‌মুখিতার সহিত যুক্ত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতিতে বৃদ্ধতন্ত্রের শাসন। এই তন্ত্র অল্পবয়সীদের শিক্ষা ও জ্ঞানকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সর্বদাই তৎপর, সেই নিয়ন্ত্রণ বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ অকার্যকর এবং বহুলাংশে ক্ষতিকর হইলেও। যথার্থ যৌনশিক্ষার অভাবই কুশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতেছে, এই সত্যটি বুঝিয়া তাঁহারা অবিলম্বে এই রাজ্যেও ছোটদের ঈষৎ বড় হইতে দিবেন কি?

আনন্দবাজার পত্রিকা (৪/১২/২০০০)

## পরিশিষ্ট—৩

## এডস্ ঃ বিপদ গভীর

ইউ এন এ আই ডি এস বা রাষ্ট্রপুঞ্জের এডস্ সংস্থা জানাইতেছে প্রতি ১,০০০ সাবালক ভারতীয়র মধ্যে সাতজন এইচ আই ভি পজিটিভ। এইচ আই ভি পজিটিভ হইলেই যে এডস ব্যাধি দেখা যাইবে, তাহা অবশ্য নহে। কিন্তু স্পষ্টতই এইচ আই ভি. এইডস্ সম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন, নয়তো সামলানো অসম্ভব। ১৪ বৎসর ধরিয়া ভারতে এইডস সংক্রমণ স্বীকৃত, তাহার পূর্বে চোখ বন্ধ রাখাই ছিল একমাত্র প্রতিক্রিয়া। ১৯৮১ সালে আমেরিকায় এডস্ ব্যাধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতে ভাবা হইয়াছিল ইহা পাশ্চাত্যের ব্যাধি, যথেচ্ছ যৌনতা ও ব্যভিচার ওইসব পাশ্চাত্য দেশে চলিতে পারে, আমাদের দেশের সঙ্গে তাহার কী সম্পর্ক? যে অ্যান্টিজেন ব্যবহার করিয়া এইচ আই ভি-র অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়, তাহাও খোলাখুলি আমদানি করা যাইত না। পুনের দুই ডাক্তার চুরি করিয়া এই অ্যান্টিজেন আমদানি করিবার পরে ১৯৮৬ সালে চেন্নাইয়ের ১৪ জন যৌনকর্মীর মধ্যে প্রথম এইচ আই ভি. আবিষ্কৃত হয়। তাহা সত্ত্বেও ১৯৯২-এর পূর্বে কিছু করা হয় নাই কারণ তখনও ভাবা হইয়াছিল ইহা পাশ্চাত্যের সমস্যা, বড় জোর যৌনকর্মীদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে, ইহা সাধারণের সমস্যা নহে। ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয় ন্যাশনাল এডস্ কন্ট্রোল আর্গানাজেশন (এন এ সি ও)। বর্তমানে (১৯৯৯ হইতে ২০০৪) এডসের বিরুদ্ধে অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় চলিতেছে। এন এ সি ও-র সংগৃহীত তথ্য মারফত জানা যাইতেছে ভারতের ৩৫ লাখ ব্যক্তি এডস্ ব্যাধিতে আক্রান্ত। সাধারণ অর্থে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের

হার ০.৭ শতাংশে, আফ্রিকার ৫ শতাংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এই সামগ্রিক প্রাদুর্ভাবের হারে অবশ্য সমস্যার গুরুত্ব ঠিক বোঝা যাইতেছে না, কারণ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রধান সমস্যা ছয়টি রাজ্যে— মাহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ড। অন্যান্য রাজ্যে ব্যাধির প্রকোপ এখনও 'হাই রিস্ক' অর্থাৎ সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত—যাহাদের মধ্যে গণ্য করা হয় যৌনকর্মীদের (যাঁহারা পুরুষও হইতে পারেন) ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের। উল্লিখিত ছয়টি রাজ্যে কিন্তু এই পর্যায় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং গুজরাতও শীঘ্রই এই ছয়টি রাজ্যের অনুসরণ করিতে চলিয়াছে। এই রাজ্যগুলিতে যাহা ঘটিতেছে সেই প্রসারণ প্রথম দেখা গিয়েছিল তাইল্যাণ্ডে। সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায় হইতে ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ে (ব্রিজ পপুলেশন)। মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যৌনকর্মীদের গ্রাহক, যৌনব্যাধিদুষ্ট ব্যক্তি ও মাদকদ্রব্য ব্যববহাররকারীর স্বামী বা স্ত্রীকে। অর্থাৎ এই মধ্যবর্তী সম্প্রদায়কে ব্যবহার করিয়া ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সচরাচর সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ে প্রাদুর্ভাবের হার পাঁচ শতাংশ অতিক্রম করা মাত্র এমন প্রসারণ শুরু হইয়া যায় এবং ব্যাধি সাধারণ জনসাধারণের মহামারিতে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগে দুই বা তিন বৎসর। উল্লিখিত ছয়টি রাজ্যে সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাদুর্ভাবের হার পাঁচ শতাংশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এইচ আই ভি/ এডস্-এ আক্রান্ত হইবার জন্য গণিকালয়ে গমনকারী ট্রাক ড্রাইভার বা যৌনকর্মী বা মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী হইতে হইবে, এ যুক্তি খাটে না। রক্তজনিত পদার্থ দূষিত হইবার ফলে রক্ত গ্রহণকারী যে কোনও ব্যক্তি আক্রান্ত হইতে পারে। সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের সীমিত থাকা কালীন এইচ আই ভি বা এডস্ নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাইল্যাণ্ডের প্রাথমিক সাফল্য তাহারই নিদর্শন। কিন্তু জনসাধারণের সঞ্চারিত হইবার পর কিছু করা অত্যন্ত শক্ত, তাইল্যাণ্ডের পরবর্তী অসাফল্য তাহারই দৃষ্টান্ত। এইচ আই ভি / এডসের বিরুদ্ধে কোনও ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও ঔষধ সন্ধানের প্রচেষ্টা চলিতেই থাকিবে। প্রায় ৩০টি ঔষধ বর্তমান, যাহাদের ব্যবহার করা হয় চিকিৎসার জন্য এবং যাহাদের সমষ্টিগত ভাবে 'হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই ধরনের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ব্যাধির যৎসামান্য উপশম সম্ভব। তাহা ছাড়া আছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সমস্যা। চিকিৎসার জন্য প্রতি বৎসর খরচ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই প্রধান প্রতিরক্ষা। সংক্রমণপ্রবণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযান তো চলিতেছে। জনসাধারণকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কি? নাবালকও আক্রান্ত হইতে পারে, তাহাদের শিক্ষার জন্য কী করা হইবে? স্কুলে যৌন বিষয়ক শিক্ষাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে, এইচ আই ভি/ এডস্ তো দূরস্থান।

—আনন্দবাজার পত্রিকা (১৩/১২/২০০০)

# Teenagers' sex dilemma

AMERICAN society winks over teenage sex. but what choices do teenage girls have when they become pregnant? Some become unwed mothers, drop out of school and go on welfare. Others go for abortion and try to start life again.

It has been estimated that 45 per cent American female teenagers have pre-marital sex and most do not use contraceptives regularly. Consequently 40 per cent become pregnant at least once before they reach age 20. In 1996, about a million pregnancies will occur among teenagers between the ages of 15 and 20.

Teenagers constitute the most neglected, confused and exploited demographic group in America today. Their voices are not heard because they do not form anyone's political constituency. Many parents don't know what to do with them except to send them to school and hope that nothing would go wrong with them. The cycle of misery continues for many of them.

Consider how the lives of two New Jersey teenagers, Amy S. Grossberg and Brian C. Peterson Jr., took a twisted turn. Coming from affluent families and raised in beautiful sylvan neighbourhoods, they dreamed of a different kind of future rather than raising a child when they were hardly out of school.

So on the early morning of November 12, Mr. Peterson, a freshman at Gettysoburg Collage in Pennsylvania, drove his pregenant girlfriend, Miss Grossberg, from her college dorm at the University of Delaware to a motel, where he helped her deliver the child. But they did not know what to do with their newborn son and, according to reports, the infant was wrapped in a plastic bag and dumped into a trash container behind the motel.

Probably it was too much for the 18-year-old boy to keep the heinous deed to himfelf, so he went to his college counsellor and told him how they got rid of the baby. Later on when the child was found dead with skull fractures, the unmarried teenage couple was charged with homicide and the prosecutors plan to seek the death penelty in the case. What could have gone wrong with these two all American teen-agers who grew up in stable families, one a sportsman and the other an arts major ? Why did sex education, to whcih all school kids are subjected fail them ?

Sex education began in 1964 when a group of educators and social activists founded the Sex fnformation and Education Council of the USA. The group's agenda to "expand the scope of sex education to all age levels and gorups" became the basis of sex-education guideliners in public schools

and resonated well with the Playboy philosophy of the liberal – some call it decadent – decade of the 1960s. Congress gave it legitimacy by subsidizing birth control for the poor and later on extending it through the Adolescent Pregnancy Act of 1978.

But comprehensive sex education dissipated into explicit sex education in many schools, for example, in New York and California where even sceond-graders are taught to model their genitals in clay and use cucumbers for condom training. While sex education had multiplied without creating any impact on teenage sexual behaviour, standards in mathematics, science, reading and writing have not imporved. Today many American teenagers know neither how tp protect themseleves from sexually transmitted diseases (STD), nor from the sexul advances of their teachers, coaches and other older adults, as was most painfully dramatized in a recent television movie, for My Daughter's Honor.

Goverment-funded family planning clinics have sprouted on many school campuses across the country, providing pills and condoms and referrals to teenage girls for abortion services without the consent of their parents. To catch them young, schools have been giving sex education at an incresingly younger age, thus increasing the odds, according to one study, of even 14-year-olds engaging in sex by 50 per cent.

Federal and state Governments spend more than a billion dollars in sex education, including contraceptive and abortion services, to teenagers, an amount which might be spent more profitably in raising teachers' salaries and improving laboratories.

Two research findings based on national probability samples were published in Family Planning Perspectives in 1986. They showed with a preponderance of evidence that teenagers who had been exposed to sex education at an early age were more prone to engage in sex than those without any exposure.

Sex education has not only failed in America but the way it is imparted might be responsible for heightened sexual activity, abortions and A high rate of STD among teenagers. The question is whether the Government's intervention has encouraged illegitimacy and casual sex among teenagers.

It is time to try something else, something old fashioned. Moral instructions, self-restraint, social outrage and a sense of shame might bring back sanity to American teenagers. In the matter of Sex, teenagers must be told, Just Don't Do It. (*N.D. Batra is Professor of Communications, Norwich University, Vermont*)

—The Statesman (1.12.1996)